

নবজাগরণের ভগীরথ হিসেবে বাংলা কাব্য সাহিত্যে মদনমোহন
তর্কালঙ্কার

ড. সুদীপ মুখার্জী

বিভাগীয় প্রধান, সত্য কিঙ্কর দে একাডেমি, আমোদপুর, বীরভূম।

ড. সমীররঞ্জন অধিকারী

অধ্যাপক, শিক্ষাতত্ত্ব বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পুরুলিয়া।

বাংলা সাহিত্য তথা বাংলা জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার ইতিহাসে ঊনবিংশ শতক এক গুরুত্বপূর্ণ কালপর্ব। ঊনবিংশ শতক ছিল বঙ্গ সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজ বিকাশের ক্ষেত্রে এক যুগসন্ধিক্ষণ। আর ঠিক এই সময়েই বাংলায় জন্ম নিয়েছিলেন এমন কিছু মনীষী বা মহামানব যাঁরা মননে, চর্চায়, ভাবনায়, সৃজনশীলতায় নবজাগরণের ভাগীরথ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। সময় এবং সমাজের প্রয়োজনেই এই সকল মনীষীর আবির্ভাব। ঊনিশ শতকের নবজাগরণের পালাবদলে মদনমোহন তর্কালঙ্কার এক অবিস্মরণীয় ব্যক্তি। বাংলার নবজাগরণের প্রেক্ষাপটে মদনমোহন তর্কালঙ্কার সাহিত্য সৃষ্টিতে, শিক্ষা বিস্তারে বিশেষ করে নারী শিক্ষার বিস্তারে, সমাজ সংস্কারে ও প্রশাসনিক দায়ভারে সকল ক্ষেত্রেই বিশেষ ছাপ রেখে গেছেন। মদনমোহনের জন্ম ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে এবং মৃত্যু হয় ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে। সুতরাং মদনমোহনের জীবনকাল মাত্র ৪১ বছর। মদনমোহনের এই সংক্ষিপ্ত জীবনে মাত্র দুটি কাব্য রচনা করেছেন। কাব্য দুটি তাঁর কৈশোর বয়সের রচনা। প্রথম কাব্য ‘রসতরঙ্গিনী’ (১৮৩৪) রচনা করেন মাত্র ১৭ বছর বয়সে এবং দ্বিতীয় কাব্য ‘বাসবদত্তা’ রচনা করেন তার ঠিক দুই বছর পর অর্থাৎ ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে। মধ্যযুগের কবি ভারতচন্দ্রের কাব্যে অনুপ্রাণিত হয়ে মদনমোহন তাঁর সাহিত্য রচনা শুরু করেন ঠিকই তবে নবজাগরণের আলো তাঁর সাহিত্যে বিশেষভাবে প্রভাব ফেলে। নবজাগরণের যুগের সাহিত্যের প্রধান প্রধান লক্ষণ গুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাঁর রচিত কাব্য দুটিতে। মদনমোহনের কাব্যে ফুটে উঠেছে মানবতাবাদ, যুক্তিবাদ, অতীত ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার, নারী মুক্তির বিশেষ বিশেষ দিক। কাব্য দুটির শিক্ষাগত মূল্যও যথেষ্ট। সুতরাং ঊনিশ শতকের নবজাগরণের যুগে মদনমোহন তাঁর কাব্যের দ্বারা আধুনিকতা, মানবতা, যুক্তিবাদীতার সঙ্গে ভারতীয় ঐতিহ্য সংস্করণের যে প্রয়াস নিয়েছিলেন তা আধুনিক কালেও সেই কাব্যধারার দ্যুতি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে জাজ্বল্যমান।

সূচক শব্দ: ঊনিশ শতক, নবজাগরণ, কাব্যধারা, মানবতাবাদ, যুক্তিবাদ, অতীত ঐতিহ্য

ভূমিকা

উনিশ শতকের নবজাগরণের পালাবদলে মদনমোহন তর্কালঙ্কার এক অবিস্মরণীয় ব্যক্তি। বাংলার নবজাগরণের প্রেক্ষাপটে মদনমোহন তর্কালঙ্কার সাহিত্য সৃষ্টিতে, শিক্ষা বিস্তারে বিশেষ করে নারীশিক্ষার বিস্তারে, সমাজ সংস্কারে ও প্রশাসনিক দায়ভারে এই সকল ক্ষেত্রেই তাঁর ছাপ রেখে গেছেন। মদনমোহনের দুটি কাব্য রসতরঙ্গিনী ও বাসবদত্তায় নবজাগরণের যুগে সাহিত্যের প্রধান প্রধান লক্ষণগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁর ‘দ্বীশিক্ষা’ প্রবন্ধে এবং সঙ্গীতগুলিতেও নবজাগরণের প্রভাব বর্তমান। শিশুশিক্ষা, নারীশিক্ষা, সমাজ সংস্কার এবং প্রশাসনিক দায়ভারেও তিনি ছিলেন নবজাগরণের একজন পথিকৃত।

প্রেক্ষাপট

মদনমোহনের জন্ম ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে এবং মৃত্যু হয় ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে। সুতরাং মদনমোহনের জীবনকাল মাত্র ৪১ বছর। মদনমোহন এই সংক্ষিপ্ত জীবনকালে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মধ্যযুগের বাংলায় সংস্কারের নব জোয়ার এসেছিল। নবজাগরণ ঘটেছিল এই বাংলায়। মদনমোহনের শিক্ষা চিন্তা ও সমাজ বিকাশ ভাবনা এই নবজাগরণের আবহাওয়াতেই জন্ম ও পুষ্টি লাভ করেছিল। মদনমোহন তর্কালঙ্কার যে সময়কালে সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছিলেন সেই সময়কালটা ছিল উনিশ শতকের তৃতীয় দশক; যখন রাষ্ট্রে, সমাজে, শিক্ষায় সর্বত্র চলছে ভাঙাগড়ার খেলা। এই সময়কালে নবচেতনার আলোকে আলোকিত কলকাতা শহরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের ক্রমশ আগমন ঘটছে। নতুন নতুন ভাবনা-চিন্তা নতুন কিছু করার তাগিদ জাগছে তাঁদের মনে। তৎকালীন ও পূর্বের কু-প্রথা ও রীতি-নীতির প্রতি সংশয় ও বিরোধিতা তৈরি হচ্ছে। প্রচলিত ধারণার বেড়া জাল ভেদ করে নতুন নতুন চেতনার উন্মেষ ঘটতে শুরু করছে। পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ সঞ্চারিত হচ্ছে বাঙালীর মনে। প্রাচীন ঐতিহ্যের পুনরাবিষ্কার ও পুনরুদ্ধারের অনেকে উৎসাহিত হচ্ছেন। আসল কথা নানা দিক থেকে সমাজের একটা পরিবর্তন চোখে পড়ছে। এর প্রভাব যে কোনো পণ্ডিত বা শিক্ষিত মানুষের মধ্যে পড়াটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। সেক্ষেত্রে মদনমোহন তর্কালঙ্কারও ব্যতিক্রমী ছিলেন না। যেহেতু তিনি নবজাগরণের ভরকেন্দ্র কলকাতা শহরে অবস্থান করছেন বাল্য কাল থেকে। মদনমোহনের ব্যক্তিজীবনে নবজাগরণের প্রভাব পড়লেও সাহিত্যসাধনায় ক্ষেত্রে কতটা প্রভাবিত হয়েছেন সেটিই এখানে আলোচনার বিষয়। তাঁর সাহিত্য চর্চা ও সাহিত্য সাধনার সময়কালটা ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত। মদনমোহন তাঁর সাহিত্য জীবনে মোট দুটি কাব্য রচনা করেছেন। এবং এই কাব্যদুটিই তাঁর কৈশোর বয়সের রচনা। প্রথম কাব্য ‘রসতরঙ্গিনী’ রচনা করেন মাত্র ১৭ বছর বয়সে অর্থাৎ ১৮৩৪ সালে এবং দ্বিতীয় কাব্য ‘বাসবদত্তা’ রচনা করেন তার ঠিক দুই বছর পর অর্থাৎ ১৮৩৬ সালে। পরবর্তীকালে নানান প্রশাসনিক দায়ভার নিয়ে জনমুখী ও সমাজকল্যাণমুখী কর্মকাণ্ডে নিজেকে কর্মব্যস্ত করে ফেলায় সাহিত্য জগৎ থেকে তিনি সাময়িক অবসর নেন।

গবেষণার উদ্দেশ্য (Objective of the Research)

নবজাগরণের ভগীরথ হিসেবে বাংলা কাব্য সাহিত্যে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের ভূমিকা পর্যালোচনা করাই বর্তমান গবেষণার মূল এবং সাধারণ উদ্দেশ্য।

গবেষণা পদ্ধতি বিজ্ঞান (Methodology of Research)

বর্তমান গবেষণাকর্মটি ঐতিহাসিক গবেষণামূলক পদ্ধতিকে অবলম্বনের মাধ্যমে সুসম্পন্ন করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই গবেষণাপত্রটি আসলে গুণগত গবেষণা পদ্ধতি বা Qualitative Research হিসেবে পর্যালোচিত।

উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতি

ঐতিহাসিক গবেষণার ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহের জন্য একাধিক উৎস বর্তমান। তবে উৎসগুলিকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে –

(অ) প্রাথমিক উৎস (Primary Source), এবং

(আ) গৌণ উৎস (Secondary Source).

প্রাথমিক উৎস

বর্তমান গবেষণার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বা প্রাথমিক উপাত্ত হিসেবে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের স্বরচিত গ্রন্থগুলিকে বিবেচনা করা হয়েছে – “শিশুশিক্ষা” (তিনটি খন্ড), “রসতরঙ্গিনী”, “বাসবদত্তা”।

পরোক্ষ বা গৌণ উৎস

সমকালে বা পরবর্তী সময়ে লিখিত মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জীবনী সংক্রান্ত সংগৃহীত তথ্য;

মদনমোহনের জীবনী, সাহিত্য, সমাজভাবনা সম্পর্কিত বহুবিধ লেখকের আলোচনা, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ও গবেষণা ধর্মী পুস্তক;

তথ্যগুলির বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সাধারণত দুই ধরনের সমালোচনার সাহায্য নিয়ে থাকেন –

(অ) বাহ্যিক সমালোচনা বা External Criticism এবং

(আ) অভ্যন্তরীণ সমালোচনা বা Internal Criticism।

প্রাপ্ত উপাত্ত গুলির অভ্যন্তরীণ সমালোচনা ও বাহ্যিক সমালোচনার মাধ্যমে তথ্য নিষ্কাশন করা হয়েছে। আর এই নিষ্কাশিত তথ্যই হলো বর্তমান গবেষণার ফলাফল। তাই এই পরিচ্ছেদে প্রাপ্ত ফলাফল গুলি লিপিবদ্ধ করা হলো।

গবেষণার ফলাফল ও পর্যালোচনা

বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে মদনমোহনের আবির্ভাবকে অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, “উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগৃতির বিদ্যুৎস্পর্শ আরও একটি

মানুষকে কিভাবে সচকিত করিয়া তুলিয়াছিল, জীবন প্রতীতির উদারতর পরিমণ্ডলে স্থাপন করিয়া চিত্তলোকে একটা সমস্যাসংকুল অশান্তি জাগাইয়া তুলিয়াছিল তাহা মদনমোহন তর্কালঙ্কার (চট্টোপাধ্যায়) কীর্তিকথা বিশ্লেষণ করিলে অনুভূত হইবে।” (বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৫৯)

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলাদেশে যে কয়েকজন কবি জন্মগ্রহণ করেছিলেন মদনমোহনের স্থান তাহাদের মধ্যে প্রায় পুরো ভাগেই ছিল। মদনমোহন মাত্র পনেরো বছর বয়সে পড়াকালীনই সাহিত্য শ্রেণিতে সমানতালে বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় কবিতা লিখতে শুরু করেছিলেন। এমনই ছিল তাঁর অদ্ভুত কবিত্বশক্তি। (বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ)

সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত সাহিত্য ছাড়াও ন্যায়, অলঙ্কার ইত্যাদি বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন মদনমোহন তর্কালঙ্কার। সে সময়ে সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার; জয়গোপালবাবুও মদনমোহনের কবিত্বশক্তির খুবই প্রশংসা করতেন। আর সেই প্রশংসাই মদনমোহনকে সংস্কৃত কাব্য বা শ্লোক রচনার বিশেষ ভাবে উৎসাহিত করেছিল। সেযুগে যেখানে বাংলা সাহিত্য চর্চার তেমন সুযোগই ছিল না, সেখানে মদনমোহন কলেজে অধ্যয়ন কালে বাংলায় কাব্যরচনার মতন শিক্ষা পেলেন কীভাবে! এ যেন মদনমোহন তর্কালঙ্কারের এক বিরল বিস্ময়কর প্রতিভার স্বতঃপ্রকাশ। দ্বারকানাথ অধিকারী তাঁর কবিতায় মুগ্ধ হয়ে মদনমোহন বিষয়ে লিখলেন—

সুকবি সুন্দর মম মদনমোহন/পড়িলে কবিতা তার মুগ্ধ হয় মন।

রসতরঙ্গিনী

মাত্র ১৭ বছর বয়সে মদনমোহন অলংকার শ্রেণিতে পড়বার সময় সংস্কৃত কাব্যের আদি রসাত্মক কিছু উদ্ভট শ্লোকের সুললিত বাংলা পদ্যানুবাদ করেন। এই অনুবাদমূলক খুব সংক্ষিপ্ত কাব্যটির নাম দেন ‘রসতরঙ্গিনী’। ছাত্রাবস্থাতেই মদনমোহনের অনন্য সাধারণ কবি প্রতিভার সাক্ষ্য দেয় এই কাব্যটি। শিবরতন মিত্র এই বিষয়ে লেখেন যে, মদনমোহনের ‘রসতরঙ্গিনী’ কাব্য তাঁর প্রথম কাব্য। এই শ্লোকগুলির অনুবাদের মাধ্যমে কিশোর মদনমোহনের অসাধারণ কবিত্বশক্তির প্রকাশ ঘটেছিল। তাঁর সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকগণ কবিত্ব শক্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে, তাঁকে সেই অল্প বয়সেই ‘কাব্য-রত্নাকর’ উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।

বাসবদত্তা

মদনমোহন তর্কালঙ্কারের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থের নাম ‘বাসবদত্তা’। গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৮৩৬ খ্রিষ্টাব্দ। সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন কালে এই কাব্যটি রচনা করেন।

‘বাসবদত্তা’ কাব্যটি মদনমোহন তর্কালঙ্কারের মৌলিক কাব্য নয়। এই কাব্যটি সংস্কৃত সাহিত্যের প্রসিদ্ধ কবি সুবন্ধুর রচিত ‘বাসবদত্তা’ বর্ণিত কথাবস্তু অবলম্বনে কাব্যটি সংক্ষেপে হ্রদোবদ্ধ করেছেন কবি মদনমোহন। তাই এই কাব্যকে অবিকল

অনুবাদ বলা যায় না। তবে কাহিনি অংশে কবি মূল কাহিনীকে অনুসরণ করে অবিকল অনুবাদ না করে আপন সৃষ্টির জাল বুনেছেন। শুধু তাই নয়, সুবন্ধুর ঋণ স্বীকার করেই মদনমোহন তাঁর অনূদিত কাব্যের নামকরণও করেছেন ‘বাসবদত্তা’ নামে। মদনমোহন যুগরুটিকে বাঁচিয়ে নবজাগরণের আলোকে অনুবাদ কার্যে মন দিয়েছিলেন। বাংলা সাহিত্যের নবজাগরণে মদনমোহনের কাব্যের প্রভাব পর্যালোচনা করতে গেলে নবজাগরণকালে রচিত বাংলা সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যগুলির আলোকে মদনমোহনের কাব্যের পর্যালোচনা করতে হয়। সেক্ষেত্রে নবজাগরণের বৈশিষ্ট্যগুলি মদনমোহনের কাব্যে কতখানি পরিস্ফুট হয়েছে সেই আলোচনাই এখানে স্থান পেয়েছে।

ক) মানবতাবাদ – মধ্যযুগীয় সাহিত্যে যেভাবে দেবতা নির্ভরতা দেখা গিয়েছিল সেখানে মদনমোহনের সাহিত্যে কিছুটা মানুষের মহিমা ফিরে এসেছে। পাশ্চাত্য চিন্তা চেতনার আলোকে গড়ে ওঠা প্রশংসনীয় মন যুক্তির বামা ঘষে খসখসে চিন্তাধারাকে শানিত করতে করতে বাংলা সাহিত্যকে ক্রমশ সাবালক করেছে। সেই যুগসন্ধিক্ষণেই সাহিত্য জগতে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের প্রবেশ। আত্মচরিত রাজনারায়ণ বসু ১৩১৫ বঙ্গাব্দ) তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন, মদনমোহন তর্কালঙ্কার সেই সময়ের একজন বিখ্যাত ব্যক্তিই ছিলেন না, তিনি বঙ্গভাষার একজন সুকবিও ছিলেন। মদনমোহন তাঁর স্বল্পকালের জীবনে মাত্র দু’খানি কাব্য রচনা করেছেন। সেই দু’টি কাব্যেই নবজাগরণের জয়গান ধ্বনিত হয়েছে। আধুনিকতার লক্ষণ হিসেবে মদনমোহনের দু’টি কাব্যে মানুষের জয়গান গাওয়া হয়েছে।

মদনমোহনের কাব্য দু’টিতে আধুনিক যুগের মানব মাহাত্ম্য প্রচারের ধারা প্রস্ফুটিত হলেও দেবমুখিতা একেবারেই চোখে পড়ে না তা নয়, তবে দু’টি কাব্যেই মানবতাবাদকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। মদনমোহনের রসতরঙ্গিনী এবং বাসবদত্তার নায়ক নায়িকারা দেব-দেবীর গঁড়ি ছাড়িয়ে লৌকিক মানব-মানবী হয়ে উঠেছে।

কয়েকটি উদাহরণের উপস্থাপন করা যাক।

(অ) রসতরঙ্গিনী কাব্যে নায়ক-নায়িকার মনে যখন বিচ্ছেদ ভাবনা জেগে ওঠে তখন কাব্যের একটি কবিতায় তা প্রকাশিত হয় এমনভাবে –

না দেখিলে ব্যাকুল চিন্ত হয়।

হেরিলে পুনশ্চ ঘটে বিচ্ছেদের ভয়।

একি দেখি শুধামুখী প্রেমের কৌতুক।

না হেরিলে দুঃখ পুন হেরেও অসুখ।

এ-তো মানবের কথা, এখানে দেবত্ববাদ নয়, বরং, লৌকিক প্রেম-প্রীতি ভালোবাসার কথাই ব্যাক্ত হয়েছে, সঞ্চারিত হয়েছে।

(আ) প্রেমে বিশ্বল নায়িকা নায়ককে না দেখে অস্থির হয়ে বলে –

বল দেখি কিবা ওষুধি বলে।

পরবাসী পতি আসিয়া মেলে।।

(ই) বাসবদত্তা কাব্যে কামিনীকে পাওয়ার অভিপ্রায়ে কন্দর্পকর্তুর বন্ধু মকরন্দ যখন বলে ওঠে –

কুমারের অভিপ্রায়, শুনি মকরন্দ ।
করপুটে করে স্তব, বাড়িল আনন্দ ।।
প্রেমানন্দে নিরানন্দ, কেন বন্ধু আর ।
সুসাধ্য স্বপন সিদ্ধ, করিব তোমার ।।

এ তো লৌকিক জীবনের কথা। বন্ধুরা সব সময় বন্ধুর পাশে থাকে।
লৌকিক জীবনে এমন উদাহরণ অনেক পাওয়া যায়।

(ঈ) কন্দর্পকেতু বাসবদত্তার বিবাহের খবর শুনে কামিনীকে নিয়ে পলায়ন
অংশে কবি লিখেছেন –

এ দিকেতে যুবক, যুবতী দুই জন।
বাছিয়া লইল অশ্ব, গমনে পবন।।
মনোজবে নাম তার, পৃষ্ঠে আরোহিয়ে।

এইরকম উদাহরণ রসতরঙ্গিনী ও বাসবদত্তা কাব্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে প্রচুর
আছে। তাই মদনমোহন যুগরুটিকে বাঁচিয়ে লৌকিক প্রেমের আশ্রয়ে কাব্য দু'টি
রচনা করেছেন।

খ) যুক্তিবাদ – অদৃষ্টবাদ নয়, বরং ব্যক্তি জীবনে মদনমোহন যুক্তিবাদে বিশ্বাসী
ছিলেন। এই প্রসঙ্গে মদনমোহনের নাতনী রত্নমালা দেবী লিখেছেন, “তিনি সকল
কার্যেই পুরুষকার অবলম্বন করিতেন। দৈবে তাঁহার বিশ্বাস ছিল না। তিনি
পুরুষকার দ্বারাই আপনাকে এতটা উন্নত করিয়াছিলেন।”

বাসবদত্তা কাব্যের অনেক কাহিনীতেই অদৃষ্টবাদ বা অলৌকিকতার প্রসঙ্গ
এসেছে বটে, কিন্তু সেগুলিকে ছাপিয়ে তিনি যুক্তিবাদকেই প্রতিষ্ঠা করতে
চেয়েছেন তাঁর কাব্যে। বাসবদত্তা কাব্যে ব্রাহ্মণ মুনির অভিশাপ, পাষণ্ড বৃত্তান্ত
কিংবা কন্দর্পকুমারের দৈববাণী শ্রবণ প্রভৃতি অংশে অদৃষ্টবাদের কথা থাকলেও
বুদ্ধিবলে তিনি যুক্তিবাদকেই প্রাধান্য দিতে চেয়েছেন। আসলে, তৎকালীন সমাজে
ব্রাহ্মণরা যে জাতির শ্রেষ্ঠ ছিল এবং তাঁদের মতামত দ্বারা যে সমাজ পরিচালিত
হতো সেই প্রসঙ্গে সূক্ষ্মভাবে ব্রাহ্মণ মুনী কিংবা দৈব বাণী এ সবার অবতারণা
করেছেন।

গ) অতীত ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার – মধ্যযুগের কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরকে
মদনমোহন তর্কালঙ্কার তাঁর কাব্যগুরু হিসেবে মান্যতা দিতেন। মধ্যযুগের এই
খ্যাতনামা কবির স্বীকৃতি পেতেন রাজদরবারে – সেখানে জমিদার বা রাজারা
সাহিত্যের কদর বুঝতেন। রায়গুণাকর রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি ছিলেন। বৈষ্ণব
পদাবলীর ক্ষেত্রেও ছিল নিজস্ব গোষ্ঠী। কিন্তু মদনমোহনের সময় রাজা বলতে
ছিলেন ব্রিটিশ শাসকেরা। যারা কেউ বাংলা শিখলেও সাহিত্যের বিচার করার
যোগ্যতা তাদের ছিল না।

মদনমোহন ছিলেন আধুনিক মনস্ক ব্যক্তি। মদনমোহন তাঁর কাব্য রচনার মাধ্যমে কাব্যগুরুকে অতিক্রম করতে চেয়েছিলেন বলে শোনা যায় ঠিকই, কিন্তু তিনি প্রাচীন সংস্কৃতকে সাহিত্য আঁকড়ে ধরেই আধুনিকভাবে সাহিত্য রচনা করতে চেয়েছিলেন। তাঁর দু'টি কাব্যগ্রন্থই সংস্কৃত কাব্যের ভাবানুবাদ। তবে এখানে ভাষা, ছন্দ, অলংকার, প্রয়োগে তিনি তাঁর অভিনবত্ব প্রকাশ করেছেন। মদনমোহনের কাব্য দু'টি তাঁর প্রথম যৌবনের রচনা – তিনি তখন সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। রসতরঙ্গিনী কাব্যে আদিরসের আধিক্য থাকলেও সেকালের সমালোচক ও পাঠক বর্গের কাছে যথেষ্ট সমাদরও পেয়েছিল।

অন্যদিকে বাসবদত্তা কাব্যগ্রন্থে গ্রন্থ অবতারণা অংশে মদনমোহন প্রাচীন কাব্যের ধারাটিকে অক্ষুণ্ণ রেখে পৃষ্ঠপোষক কালিকান্ত রায়ের প্রেরণার কথা উল্লেখ করেছেন। এই কাব্যটিও সংস্কৃত সাহিত্যের বিশিষ্ট গদ্য কাব্য রচয়িতা, সুবন্ধুর “বাসবদত্তা” অবলম্বনে রচিত। আসলে মদনমোহন এখানে প্রাচীন ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধারে উৎসাহিত হয়েছিলেন। বাসবদত্তা কাব্যে মদনমোহন পুরনো কাব্য ধারাকে আধুনিক ভাষায় নিজের মতো করে রূপান্তরিত করে নিয়েছেন। তিনি তাঁর কাব্যে পদাবলীর রীতি ও প্রাচীন সাহিত্যকে নতুন করে পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেছেন।

ঘ) নারী মুক্তি – তৎকালীন পুরুষ শাসিত সমাজে নারীকে পুরুষের সম্পদ বলে বিবেচনা করা হতো। নারীর ছিল না কোনো স্বাধীন অধিকার। নারীকে ভোগ্যবস্তু হিসেবেই দেখা হতো। মদনমোহন তাঁর কাব্যে নারীকে মর্যাদা দিলেন। রসতরঙ্গিনী কাব্যে নারীর রূপ-বর্ণনায় তিনি নারীকে শুধু কামনার বস্তু নয়, বরং, অন্য রূপেই প্রতিষ্ঠিত করলেন। নারীর রূপের বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি প্রকৃতির অপরূপ রূপ যাতে মলিন না হয় তার জন্যই বিধাতা নারীর সৃষ্টি করেছেন বলে মনে করেছেন। আর, নারীর রূপেই নয়ন সুখ পাওয়া যায়। তাই শুধু কামনার দৃষ্টিতে নয় মধুর দৃষ্টিতে নারীকে চেয়ে নয়ন-সুখ নিতে বলেছেন।

বাসবদত্তা কাব্যে নারীকে স্বাধীনচেতা করে তুলেছেন সেখানে নায়িকা বাসবদত্তা স্বেচ্ছায় বাবা অমতে পালিয়ে গিয়ে নিজ প্রেমিক কন্দর্পকেতুকে বিয়ে করেছেন। অন্যদিকে, ‘রসতরঙ্গিনী’ কাব্যেও নারী মুক্তি কথা বর্ণিত হয়েছে। সেখানেও নারীদের একাকিনী যেতে, ভয় না পেয়ে অভিসার যাত্রায় অগ্রসর হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

ঙ) শিক্ষাগত মূল্য – রসতরঙ্গিনী ও বাসবদত্তা কাব্য কতকগুলি কবিতার ভাবানুবাদ ঠিকই, কিন্তু মদনমোহনের এই কাব্যদুটি সংস্কৃত শিক্ষায় শিক্ষিত নব্য যুবকদের আকৃষ্ট করেছিল। এখানে আদিরসের প্রাধান্য থাকলেও এগুলি প্রকৃত পক্ষে মানব প্রেমেরই কবিতা। অন্যদিকে বাসবদত্তার কাহিনী পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত হলেও মদনমোহন এই কাব্যকে নতুন কাব্যিক আঙ্গিকে প্রকাশ করেছেন। এই কাব্যটি পাঠ করে নব যুবকরা আকৃষ্ট হওয়ার সাথে সাথে প্রাচীন সাহিত্য, সংস্কৃতি ও পুরাণকে জানার জন্য আরও বেশী করে অনুসন্ধিৎসু হয়ে ওঠার রসদ পেয়েছিল।

উপসংহার

উনিশ শতকে নবজাগরণের যুগে মদনমোহন তাঁর কাব্যের দ্বারা আধুনিকতা, মানবতা, যুক্তিবাদিতার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় ঐতিহ্যকে সংরক্ষণের যে প্রয়াস নিয়েছিলেন তা সেকালকে আলোকিত করেছিল বলাই যায় কিন্তু আধুনিক কালেও সেই কাব্যধারাকে দুটি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জাজ্জ্বল্যমান।

গ্রন্থপরিচয়

আকর গ্রন্থ

তর্কালঙ্কার মদনমোহন (১২২৮ বঙ্গাব্দ) ‘বাসকদত্তা’, যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কতৃক সম্পাদিত, নুতন ভারত যন্ত্র, তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা।

তর্কালঙ্কার মদনমোহন (১৮৫০) শিশুশিক্ষা তৃতীয় ভাগ সংস্কৃত যন্ত্র। কলকাতা।

তর্কালঙ্কার মদনমোহন (১৮৫০) শিশুশিক্ষা দ্বিতীয় ভাগ স্কুল বুক সোসাইটি কলকাতা।

তর্কালঙ্কার মদনমোহন (১৮৫০) শিশুশিক্ষা প্রথম ভাগ সংস্কৃত যন্ত্র দ্বিতীয় সংস্করণ কলকাতা।

তর্কালঙ্কার মদনমোহন (১৮৫০) স্ত্রীশিক্ষা নামক প্রবন্ধ সর্ববিশ্বভারতীয় পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যা, কলকাতা।

তর্কালঙ্কার মদনমোহন (১৩০২) রসতরঙ্গিনী আর্য্য যন্ত্র, চতুর্থ সংস্করণ কলকাতা
খাস্তগীর আশিস (২০০৯) শিশুশিক্ষা, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, সংস্করণ, কলকাতা - ২০।

গুপ্ত ক্ষেত্র (১৩৬৮ বঙ্গাব্দ) আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, এ কে সরকার এন্ড কোং, কলকাতা ০৯।

ঘোষ বিনয় (২০১১) বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ, ব্ল্যাক সোয়ান প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা - ৭২।

পাল নিমাই চন্দ্র (১৪১২) ‘মদনমোহন তর্কালঙ্কার গ্রন্থাবলী’, সদেশ, প্রথম সদেশ সংস্করণ, কলকাতা - ০৬।

বন্দ্যোপাধ্যায় অসিতকুমার (১৯৫৯) ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য, বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা - ০৬।

বন্দ্যোপাধ্যায় চণ্ডীচরণ (১৮৯৬) বিদ্যাসাগরের ছাত্র জীবন, সংস্কৃত প্রেস ডিভিউটরি, কলকাতা।

বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ (১৪১৯) ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, পঞ্চম সংস্করণ, কলকাতা - ০৬।

বসু স্বপন (২০০৩) উনিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি, পুস্তক বিপণি, কলকাতা - ০৯।

বসু স্বপন (১৯৭৫) বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস, পুস্তক বিপণি, তৃতীয় মুদ্রণ
২০০৯, কলকাতা - ৯।

বিদ্যাভূষণ যোগেন্দ্রনাথ (১৮৭১) কবিবর ঋমদনমোহন তর্কালঙ্কারের জীবনচরিত ও
তদ্ গ্রন্থ-সমালোচনা, নূতন ভারত যন্ত্র, কলকাতা।

বিদ্যারত্ন শম্ভুচন্দ্র (১৩০৪ বঙ্গাব্দ) চরিতমালা (প্রথম ভাগ), সংস্কৃত যন্ত্র, চতুর্থ
সংস্করণ, কলকাতা।

শাস্ত্রী শিবনাথ (২০০৯) রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, বারিদবরণ
ঘোষ কর্তৃক সম্পাদিত, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা. লি., দ্বিতীয় সংস্করণের তৃতীয় মুদ্রণ
২০০৯, কলকাতা-৯।

সরকার যদুনাথ (১৯৬০) বাংলা নবজাগরণ, কলকাতা।

সরকার সুশোভন (১৩৬৭ বঙ্গাব্দ) বাংলার রেনেসাঁস, কলকাতা।

সেন সুকুমার (১৪১৪ বঙ্গাব্দ) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (তৃতীয় খণ্ড), আনন্দ
পাবলিশার্স, প্রথম আনন্দ সংস্করণের ষষ্ঠ মুদ্রণ, কলকাতা - ০৯।

দাশ নির্মল সম্পাদিত (২০০৮) মদনমোহন তর্কালঙ্কার স্মারক গ্রন্থ, পারুল
প্রকাশনী প্রথম প্রকাশ কলকাতা - ০৯।